মানসী

মানসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ১০ পৌষ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ ১ আষাঢ় ১৩০০
কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত সংস্করণ ১৩০৩
পুনর্মুদ্রণ ১৯১২ খৃস্টাব্দ
কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত সংস্করণ ১৯১৫
পুনর্মুদ্রণ ১৯২১, ১৩৩৮
রবীন্দ্র-বচনাবলী-ভুক্ত সংস্করণ ১৩৪৬
পুনর্মুদ্রণ ১৩৪৮
নূতন সংস্করণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৌষ ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, আশ্বিন ১৩৬১
আষাঢ় ১৩৬৫, ভাদ্র ১৩৬৭, ভাদ্র ১৩৬৯, চৈত্র ১৩৭০, ভাদ্র ১৩৭২
শ্রাবণ ১৩৭৪, পৌষ ১৩৮১, আশ্বিন ১৩৮৮, অগ্রহায়ণ ১৩৯২
অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, ভাদ্র ১৩৯৯
শ্রাবণ ১৪০১

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক ম্যাসকট প্রেস
২৪৬ এ/বি মানিকতলা মেন রোড। কলিকাতা ৫৪

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই-অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
উর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'উর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই-অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ অক্ষর- যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপে গণনা করা যায় নাই— পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থের আরম্ভভাগের কতকগুলি কবিতা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত কবিতাই রচনাকালের পর্যায়-অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

'শেষ উপহার' -নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এইখানে উদ্‌ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূর প্রবাসে থাকা -প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।

গ্রন্থকার

সূচনা[1]

বাল্যকাল থেকে পশ্চিমভারত আমার কাছে রোম্যাণ্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি, এই পশ্চিমভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারত-বর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম, ব্যাবসাদারের গোলাপের ক্ষেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়ো ঘরের ঘরনী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম, তার একটা কারণ, এখানে ছিলেন আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-

[1] রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড

বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের ক্ষেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলা দেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতালে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবা মাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল শিশুর কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেইরকম। নূতন আবেষ্টনে

এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববৎ 'কড়ি ও কোমল'এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত-অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন

২৮. ২. ১৯৪০

সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথমমুদ্রণাবধি এই গ্রন্থে রচনার তারিখ বাংলা মতে

এবং বৎসর খৃস্টীয় গণনা-অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

উপহার

নিভৃত এ চিত্ত-মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা—
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ বৈশাখ ১৮৯০

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,

এসেছি ভুলে।

তবু একবার চাও মুখপানে

নয়ন তুলে।

দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে

সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,

সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি

পড়ে কি ঢুলে।

ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,

এসেছি ভুলে।

বেল-কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগনমূলে—
সেদিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি
লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল, এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি!

সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে!
কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি!
দখিনে বাতাসে কেহ নাই পাশে
সাথের সাথী।
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়—
আকুল বাতাসে মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ
আসিলে ভুলে!

বৈশাখ ১৮৮০

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধরকোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়নলোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
শরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না—
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর—
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর।

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে—

সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে !
পরদুখভার সহে নাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি পাষাণহৃদয়—
বড়ো কঠোর !
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর ।

৪৯ পার্ক্ স্ট্রীট । কলিকাতা
বৈশাখ ১৮৮৭

বিরহানন্দ

এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক
সেই স্থানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।

তবু সে ছিনু ভালো আধা-আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে।

বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোতদুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।
কোকিল কুহুতানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি!
দিবসনিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি!
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি!

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা স্বপনে।

করুণা অনুখন প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু ক'রে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত।
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত!

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত তোরি মতো স্নেহমুখ।
দেখিলে আঁখি-রাঙা পাখা-ভাঙা পাখিটি
'আহাহা' ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।

মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়া-ভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না,
তোমার পাশে রহি যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরনা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারা রাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে।
মিলনদাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার—
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া, স্নেহছায়া নাহি আর—
সকলি করে ধু ধু, প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিনবায়ু-ভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপহার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারি ধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্ ধুক্ করে বুক নিশিদিন—
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুনি দুই-তিন।
কুড়ায়ে সব-শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

জোড়াসাঁকো
৯ ভাদ্র ১৮৮৯

শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে!
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি!
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে!
আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে!

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা!
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা!
নিশীথনভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ—

নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা !
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা !

কোথা এ মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে ।
প্রেমের ফুল ফুটে আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে !
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে !
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে !
কোন্ গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে !
কোথায় মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে !

অনেক দিন পরানহীন
ধরণী
বসনাবৃত খাঁচার মতো
তামসঘনবরনী ।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা
নাই সে পাতা—

নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা।
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।

মায়াকারায় বিভোর প্রায়
সকলি।
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোনার কাঠি—
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষরসকাকলি।
মায়াকারায় বিভোর প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।

সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি—
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ
জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ।
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগৎ মম
ঝরিবে শিরে—
তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

৪৯ পার্ক্‌ স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

আত্মসমর্পণ

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কী হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয় পরান
তেমনি দেখাব খুলি।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই
আমি যেমনি করিয়া গাই
বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।

ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,
আমার ভিখারি প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুলমাঝে,
দেবী, তোমার চরণ সাজে।
অভাবকঠিন মলিন মর্ত
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কী ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ পড়ে ওইখানে
চেয়ে তোমার চরণ-পানে।
যা দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল,
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভালো করে দেখো একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শত বার।

জোড়াসাঁকো
১১ ভাদ্র ১৮৮৯

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষাপারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে,
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো।—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?

পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে !

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার !
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,

বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শ্রান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে—
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

সংশয়ের আবেগ

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন
শ্রান্তিতৃপ্তিনিদ্রাহীন
করিতেছি পান—
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত।
কখনো কঠিন কথা, কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত!
তুলি ফুল দেব ব'লে
ফেলে দিই ভূমিতলে,
করি খান-খান—
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালোবাস চির-ভালোবাসা
জনমে বিশ্বাস—

যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি—
ফেলি নে নিশ্বাস।
তরঙ্গিত এ হৃদয়,
তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্বচরাচর
মুহূর্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান।
হৃদয়দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল
লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ,
সাধিব আপন কাজ

শতগুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন,
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়ডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে—
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

বিচ্ছেদের শান্তি

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণ নয়নে
আমার মুখের পানে চাও ?
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে,
শান্ত হবে অধীর হৃদয়—
জাগ্রত জগতমাঝে ধাইব আপন কাজে,
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ,
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে—
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।

যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি এক ধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি।
একেবারে ভুলে যেয়ো, শতগুণে ভালো সেও—
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরই আছে সমাপন।
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্রজল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর—
শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে,
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে আপনার কাজ করে
সহস্র জীবন-মাঝে মিশে—
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে, তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য জাগে অবিরল—
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও—
নূতন আশ্রয়ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই।
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।

তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী—
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া—
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িত-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হয়ে রমণীর হিয়া।
বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে—
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্যপথপানে—
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন—
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ,
সেদিনও এমনিতরো অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে—
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে—
এখনো প্রেমের খেলা
সারা নিশি সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

আকাঙ্ক্ষা

আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়—
বসে বসে ভাবিতেছি আজি কে কোথায়।

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাতপাখি, কম্পিত কুলায়—
মনে জাগিতেছে সদা আজি সে কোথায়!

কত কাল ছিল কাছে, বলি নি তো কিছু—
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্যপরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয়, আজ যদি পাইতাম কাছে
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলো কেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান—

বৃহৎ বিষাদছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।

নিয়ে শুধু কোলাহল, খেলাধুলা, হাস—
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর-আকাশ।
আলোকেতে দেখো শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে!
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে!
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে—
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা!

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে—
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে।

২০ বৈশাখ ১৮৮৮

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয় যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষকোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি—
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল—
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
অর্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে ঘুরে পড়ি লুটি—
এই যারা কাছে আসে এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টিস্রোতকোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার—
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

গাজিপুর
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮

প্রকৃতির প্রতি

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর!
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর!
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালোবাসা নিস ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস
হায় মনোচোর!

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই।
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি!
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধগান,
কোথায় পিরিতি!
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি—
এ কেমন রীতি!

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারি নে তোর কারে ভালোবাসা
কারে অবহেলা।

প্রভাতে যাহার 'পর
বড়ো স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধ্যাবেলা।

তবু তোরে ভালোবাসি, পারি নে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী!
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্যনিলয়—
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে,
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি
অরুণ-অধরা!
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে—
কত ছল, কত বল,
চপলা, মুখরা!

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শতলক্ষ
নক্ষত্রকিরণ।

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চিরমৌনব্রতা—
চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরুনির্জনতা।
রবি শশী শিরোপর
উঠে যুগ-যুগান্তর—

চেয়ে শুধু চলে যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশবেশ—
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত উৎসের মতন,
নাহি লজ্জালেশ।
রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান—
নাহি তার শেষ।

কখনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষনিহত
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।
কখনো বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লান ছায়া
করুণার মতো।

তবে তো করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরান।

যুগ-যুগান্তর ধরে রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি শত মায়াবাসে
আছ সকলেরই পাশে,
তবু আপনারে কারে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি—
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

১৫ বৈশাখ ১৮৮৮

মরণস্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া,
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রলোকে— ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

সুদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে,
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে—
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে
যেন তারা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ—
পড়িয়াছে নীলাকাশনীরে
দূর মায়াজগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি   চন্দ্রালোক-পানে তুলি,
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে—
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

যেন রে প্রহর নাই, নাইক প্রহরী—
এ যেন রে দিবাহারা অনন্ত নিশীথ!
নিখিল নির্জন স্তব্ধ,   শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল কল্লোল-লহরী—
নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্নচঞ্চলিত।

কত যুগ চলে যায় নাহি পাই দিশা,
বিশ্ব নিবু-নিবু যেন দীপ তৈলহীন।
গ্রাসিয়া আকাশকায়া   ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল— এক, দুই, তিন।

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে,
প্রেতনয়নের মতো   নির্নিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায়—
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চিরযুগরাত্রি ধ'রে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগনমাঝার।
প্রাণপণে চক্ষু চাহি আঁখিতে আলোক নাহি—
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যু-হিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায়ে সুদীর্ঘ গ্রীবা নামিল মরাল।
ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া—
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়া দূরে পড়ে গেল ভেঙেচুরে,
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি—
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে।
কাতরে ডাকিতে চাহি— শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার।
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে
ব্যগ্রগামী ঝটিকার আর্তস্বরসম—
সূক্ষ্ম বাণ সূচিমুখ অনন্ত কালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া যেন চলে।
রেখা হয়ে মিশে আসে দেহমন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা,
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা—
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দুপারাবার।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার—
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার!
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী—
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটিরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

১৭ বৈশাখ ১৮৮৮

কুহুধ্বনি

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা।
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা—
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে।
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া—
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটিরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ—
তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।

কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্মগান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লানমুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর; বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি।
রাখাল শিশুরা জুটে নাচে গায়, খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ, কত খেলা, কত মানবের মেলা,
সুখদুঃখ ভাবনা অশেষ—
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।
নিখিল করিছে মগ্ন— জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল,
সংসারের আবর্তবিভ্রমে—

তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে,
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী—
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহনবীণা করে ধরি—
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে,
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর—
সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়স্বর!

কেহ ব'সে গৃহমাঝে কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে—
তবুও সে কী মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ-যুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে।
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।

সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে—
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালোবাসাভরে
পাখি গানে মানবের গানে।

কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনকজননী ;
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণসমীরস্রোতে
ভেসে আসে কুহুকুহুধ্বনি।
প্রচ্ছায়তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে ;
ঘনসহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থর' থর' ;
তখনো সে কুহুভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব—
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান
দেশ কাল করি অভিভব।

অতীতের দুঃখসুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান—
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে,
লভিতেছে নূতন পরান।

গাজিপুর
২২ বৈশাখ ১৮৮৮
সংশোধন :
শান্তিনিকেতন। ৫ কার্তিক ১৮৮৮

পত্র

বাসস্থান-পরিবর্তন উপলক্ষে
শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভিড়,
বকুনির বিড়বিড় গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে জড়ো কোণে বসে আছি দড়ো,
আর সাধ নেই বড়ো আকাশকুসুমে।
সুখ নেই, আছে শান্তি— ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' বুঝিয়াছি সার।
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর।
কাজ কী এ মিছে নাট, তুলেছি দোকানপাট,
গোলমাল চণ্ডীপাঠ আছি ভাই ভুলি।
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি?
'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়—
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে থাকি।
হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস
ছাড় শুধু দশ-বিশ শব্দভেদী ফাঁকি।
বিষম উৎপাত এ কী! হায় নারদের ঢেঁকি,
শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মতো।
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই কমা—
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্বিবাদ ব্রত।

কেদারার 'পরে চাপি ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি, মাটির মানুষ।
লেখা তো লিখেছি ঢের— এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে জ্বলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই—
নকল নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা-পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজে না ভালো, হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার সেই জ্বালো আকাশের ভালে।
মাটির প্রদীপ যার নিভে-নিভে বারবার,
সে দীপ জ্বলুক তার গৃহের আড়ালে।
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি,
শুধু ভালোবেসে বাঁচি বাঁচি যত কাল।
আশা কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে,
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু প'ড়ে পাওয়া ততটুকু ভালো—
যারা মোরে ভালোবাসে ঘুরে ফিরে কাছে আসে,
হাসিখুশি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে—
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্বতে।

বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নামগন্ধ পেলে রক্ষে নেই।
কেনা ঢোকে নাকে চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই একরোখে বুঝি দক্ষিণেই।
বাহিরেতে চেয়ে দেখি, দেবতাদুর্যোগ এ কী!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন ?
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিসার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ আর ঝর ঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল্ নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর-দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে!
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়াডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোনো দাবি।
বিরহ বকুল আর বৃন্দাবন স্তূপাকার,
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে তাই ভাবি।
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে
দু দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি-মানুষেরা অস্থিচর্মসার।
কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ ঘি'টা বহুগুণে শ্রেয়।
সাঙ্গ করি এইখানে— শেষে বলি কানে কানে,
পুরানো বন্ধুর পানে মুখ তুলে চেয়ো।

বৈশাখ ১৮৮৭

সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন-উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্রকোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদগর্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি আছাড়ি লাঙ্গুল।

যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠেছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন!
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে।
দিগ্‌বিদিক নাহি জানে, বাধাবিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয়-পানে আপনারি ত্রাসে।
হেরো, মাঝখানে তারি আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে— রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে,
'দাও দাও দাও!'
সিন্ধু ফেনোচ্ছলছলে কোটি উর্ধ্বকরে বলে,
'দাও দাও দাও!'
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।

অধ ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান,
হায় ভগবান!
'দয়া করো' 'দয়া করো' উঠিছে কাতর স্বর,
রাখো রাখো প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ!
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার—
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র-আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস!
ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ 'হায় হায়' থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।

যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একস্তরে
শত দীপ-আলো—
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো।

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে!
কেন করে টলমল্ দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা!

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই-যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে,
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!

মরণের মুখে ধায় সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন !
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে,
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি ?

এ বল কোথায় পেলে ! আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে !
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে ?
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব-অমৃত-পানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান, সে কি মাতৃহীন ?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননীপ্রাণে
স্নেহ মৃত্যুঞ্জয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
একসাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে— নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।

জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?—
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

৪৯ পার্ক্ স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

শ্রাবণের পত্র

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়— এসো চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে, ভাই, তখন করিবে তাই;
কালাকাল মানা নাই, কলির বিচার!
শ্রাবণে ডেপুটিপনা এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।
ছুটি লয়ে কোনোমতে, পোর্ট্‌মাণ্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেল-পথে করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা-শাসি বসি একবার।
বজ্ররবে সচকিত্‌ কাঁপিবে গৃহের ভিত,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র-খড়্‌খড়্‌!
হা রে রে ইংরাজ-রাজ এ সাধে হানিলি বাজ!
শুধু কাজ, শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্‌।
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে—
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান,
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবনমধু,
মুচেছে পথিকবধূ সজল নয়ান।

যেন রে শরম টুটে কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল—
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে—
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে সর্বিসের ফেরে।
এ দিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন জল-ঝরা সঘন গগন।
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে,
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁট মুণ্ড করি হেঁট মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ—
এদিকে যে গোরা মিলে কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে নাই কোনো খোঁজ।
দেখিছ না আঁখি খুলে ম্যাঞ্চেস্টর লিভারপুলে
দেশী শিল্প জলে গুলে করিল finish।
'আষাঢ়ে গল্প' সে কই, সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিস।
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা!
সে তাকিয়া— গল্পগীতি সাহিত্যচর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো-ভরা!

কোথায় সে যদুপতি ! কোথা মথুরার গতি !
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ, নহে সৎ—
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর ।
অতএব ত্বরা ক'রে উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল ।
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর,
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral ।)

শ্রাবণ ১৮৮৭

নিষ্ফল প্রয়াস

ওই-যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীরতিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্যতরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবনললিতলতা বাহুর বন্ধন,
এরা তো তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ—
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস ?

মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু-আলিঙ্গন ?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহনিমগন ?

তবে মোরা কী লাগিয়া করি হাহুতাশ !
দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়— বৃথা সে প্রয়াস।

৪৯ পার্ক্‌ স্ট্রীট
১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

হৃদয়ের ধন

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।

অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

নাই, নাই— কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।

প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে—
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে!

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নিভৃত আশ্রম

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।

রাখিয়া দুয়ার রুধি আপনার মনে
তাহার আলোকে রব আপন ছায়ায়,
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।

ভ্রমর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।

লোকালয়-মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথি-সনে।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি;
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে চাওয়া
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসাআসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?

কেন আন বসন্তনিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান-হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষমানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন—
বিমল শরতকাল শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীতবায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল।
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে-বিষাদে-মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জানো না তাহা— আমি তাহা জানি।

সে কী মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে কোন্ আকর্ষণডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে!

ক্ষণিক বিরহ- অবসানে
নিবিড় মিলনব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি,
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সবকথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারা দিন ধ'রে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা—
হয়তো বা কাছে এস, হয়তো বা দূরে বস,
সে সকলই ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ—
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই-তিন!

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)
প্রেমে দেয় কতখানি কোন্ হাসি কোন্ বাণী
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা—
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি! এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

২১ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধো-আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার।
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা!
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়—
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসরসুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতিবধূর।
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখির অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়—
প্রেম চিরদিন রয় এ চিরজীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর—
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে!
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল—
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ-স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ—

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কত বার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুররহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো চোখে দেখা,
চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল্—
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি—
কী যে রাখি কী যে ফেলি বুঝিতে পারি নে।

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস—
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি বসে ফুলদল
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া—
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে 'হায়-হায়',
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় একি সব ফাঁকি—
এই বুঝি, আর কিছু নাই।
অথবা যে রত্ন-তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা—
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরই মাঝে ক্লান্তি কেন আসে!
উঠিবারে করি প্রাণপণ—
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার!
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার!

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে।
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্যসম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই— তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্তসমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দমুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

পার্ক্ স্ট্রীট
২৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

শূন্য গৃহে

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানবহৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন !
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন !

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা ব'লে কি করুণা পাব না ?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা ব'লে কি জননীর বাজে না বেদনা ?

দুর্বল মানবহিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভরহারা ধুলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম !

সেথাও জগৎ তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ !
ছিন্ন করি অন্তরাল অসীমরহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ !

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না,
করুণমর্মর কণ্ঠস্বর—
'আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর ।

'নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে—
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠিছে আকাশ-'পর
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে।'

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত ?

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি ;
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ ;
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান,
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা !

গাজিপুর। ১১ বৈশাখ ১৮৮৮

জীবনমধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে ;
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল ;
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার ;
ধরণীর ধূলি-মাঝে গুরু আকর্ষণ—
পতন হইল কত বার।
আপনার 'পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই ;
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলি-সাথে মিশে
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিলনির্ভর !

অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার 'পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ।

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চিরস্বপ্রকাশ!

যখন জীবনভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ—
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য অসীম অতুলন—
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষন্ন উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণগঙ্গা সৈকতশয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্টনয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবনলহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল—
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা—

মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি ;
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে ;
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবনকুহরে
মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ ১৮৮৮

শ্রান্তি

কত বার মনে করি, পূর্ণিমানিশীথে,
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস-আঁখি-সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন !
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়নদ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে, গঙ্গা কোথা বহে চলে,
নিদ্রায় সুষুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবনগাথা
আপনার মনে—
চিরজীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গ'লে আসে
নয়নের কোণে।
স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।

১৬ বৈশাখ ১৮৮৮

বিচ্ছেদ

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ,
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস,
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুছিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারি দিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি, অন্তিম মহিমা,
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে—
বিষন্নকিরণপটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন—
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল।
নয়নের দৃষ্টি গেল— রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ ১৮৮৮

মানসিক অভিসার

মনে হয়, সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি বাতায়ন হতে নয়ন উদাস ;
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস ।

ত্যজি তার তনুখানি কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে ;
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়,
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে ।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়,
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে ;
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে ।

তারি ভালোবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোরসম বিরহতিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল—
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস ।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

পত্রের প্রত্যাশা

চিঠি কই ! দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো,
আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া ।
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া ।
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে ।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি, টলমল পড়ে ঢুলি
কূলে-বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে ।

চিঠি কই ! হেথা এসে একা বসে দূর দেশে
কী পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে !
গোধূলির ছায়াতলে কে বলো গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে ।
গভীর গুঞ্জনস্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতিকণ্ঠস্বর !
তীরতরুছায়ে-ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর !

পাখি তরুশিরে আসে দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে—
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর
কেন এ কোলের 'পর আসে না নীরবে !

দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি
কলরব-ভরা প্রীতি লয়ে তার মুখে,
দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত
নিশি নিমেষের মতো কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলই তো মনে আছে, যতদিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালোবেসে—
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায় নি ঠাঁই,
মুহূর্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা-কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে, চোখে আসে জল—
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবনসম্বল।

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা—
'তুমি ভালো আছ কি না' 'আমি ভালো আছি'।
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত,
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরিপারে—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুটি করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে।

অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল্‌, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল— শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা— হেরি একদিঠি।
আর যে আসে না আসে উন্মুক্ত এ মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে, অন্ধকার হতে কহে,
'যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা।
সীমাপরপারে থাকি সেথা হতে সবে ডাকি,
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।'

২৩ বৈশাখ ১৮৮৮

বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্'।

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।

কাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে—
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে—

'কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ,
গ্রাম্যবালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?'

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি—
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট;
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগো—
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও উঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষতরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল—
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

সংশোধন ও পরিবর্ধন :
শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন ?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি—
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে !

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা—
করিত দক্ষিণবায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষার ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়—
প্রান্তরের প্রান্তদিশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকেল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি।
সুখদুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপাশাখে সোনা-ফুল ফুটে থাকে—
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল আছে অবিকল—
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে।
ভাঙিয়া দেখে নি কেহ হৃদয় গোপন-গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি—
পল্লবের সুচিকন ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কী বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে, তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বৈ কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

একি নিদারুণ ভুল! নিখিলনিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে।
শতলক্ষ-আঁখি-ভরা কৌতুককঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে!

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
পরিবর্ধন : শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে।

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায়!

ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালো বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।

যার নবনীসুকুমার কপোলতল
কী শোভা পায় প্রেমলাজে গো!
যাহার ঢলঢল্ নয়নশতদল,
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা, এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে,
মনেরই কালোকূপে থেকে যায়।

দেখো বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই,
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর—
ধন সে যতনের শয়ন-স্বপনের,
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
প্রিয়েরও চেয়ে সে যে মহীয়ান।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ-মাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহি নে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা!

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনো-আশা দলে যাই।
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে 'এ কে!'
ছু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী—
পাছে সে মনে ভানে 'এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহি নি!'

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে—
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে,
মিলায়ে থাকে মাঠে—
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা
বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলসঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।

দিবসশেষে বাহিরে এসে
সেও কি এতখনে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে-ঢাকা
বিজন ফুলবনে!

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ প'ড়ে
তুলেছে রাঙা করি,
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে—

জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি পড়ি।

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি
শরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি।

সলিলতলে সোপান-'পরে
উদাস বেশবাস!
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে-ভরা
গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখি
আপন মনে উঠিছে ডাকি,
বিবশ হয়ে বকুল ফুল
খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে,
মিলায়ে আসে আলো।

নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশশেষে যেতেছে দেখা
নিদ্রালস আঁখির 'পরে
ভুরুর মতো কালো।

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবনলাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি যূথীর হার
বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মতো রাখি।

বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে
যেমন করে দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা ?
ক্ষণেক শুধু অবশকায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে,
আলোতে করে দূর।
যেমন দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুখনিশি নিকটে টানে—

সুখের প্রাতে যাহারা রহে
  আপনা-ভরপুর।

*আঁধারে যেন দুজনে আর
  দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়—
  হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
  হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিত যেন গিয়েছি দোঁহে
  জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন
  বহিয়া খরধারে।
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
  নিশীথপারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত,
থামিল কলতান—
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালো-মানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে!

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি,
গৃহের প্রতি টান—

তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে-ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালিসন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন—
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধা-হীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে

নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্ব-মাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের—
ঝঞ্ঝা-মাঝে ধায় সে প্রাণ,
সিন্ধু-মাঝে লুটে।

নিমেষ-তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে!
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!

কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর!

কিসের এত অহংকার!
দম্ভ নাহি সাজে।
বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহ-মাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়কর

প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর !
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাথা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্প-ভরে
পৃথ্বী থরহর !

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডি-মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে রেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল,
কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্‌
ভারতমাতা করেন গ্রোন
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এসো তো করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশানে।
আয় রে ভাই, সবাই মাতি,
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্যজাতি
রসাতলের পানে।

উৎসাহেতে জলিয়া উঠি
দু হাতে দাও তালি।
'আমরা বড়ো' এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।

কাগজ ভরে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
কলম আর কালি।
চারটি ক'রে অন্ন খেয়ো,
দুপুরবেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো,
বাক্যানল জ্বালি।
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি।

দূর হউক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়-না ভাই, বিরোধ ভুলি—
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি

পথের যত মতের ধূলি
আকাশ-পরিমাণ !
পরের মাঝে ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান।

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে।
'ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়'
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

'পরের কাছে হইব বড়ো'
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্য-পানে তুলে।
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি—
তাহাই যেন সমাধা করি,
'কী করি' বলে ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে—

মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহংকার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভানে,
পেথম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে—
আপন গৌরবে।

বাহবা কবি, বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ।
এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
ছুটাও ভাষা-অগ্নিকণা,
আমরা করি সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ।
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।

যাক্‌-না দেখা দিনকতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক
'জাতীয়' উপদেশ।
নয়ন বাহি অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল,
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিতকেশ।

রক্ষা করো! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভাকাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।
দশ জনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে,
তাদের আমি নই।
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে
মরিছে যবে মাথাটা কুটে,
দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে
বক্তৃতার খই,
হয়তো আমি শয্যা পেতে
মুগ্ধহিয়া আলস্যেতে

ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীরশাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হৈ হৈ!

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
থাকুক আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি—
তুমিও চলো, আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মতো!
ঘরেতে ফিরে খেলো গে তাস,
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাকো বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিন-পশু-প্রায়।

তরল হাসি-লহরী তুলি
রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি,
সকল কিছু যাইয়ো ভুলি—
ভুলো না আপনায়!

আমিও রব তোমারি দলে
পড়িয়া এক ধার—
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর।
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার।
বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই—
চেষ্টা নাই তার।

হোথায় দেখো খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছসংসার !

ফুকারো তবে উচ্চরবে
বাঁধিয়া এক সার-
মহৎ মোরা বঙ্গবাসি
আর্যপরিবার !

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে ;
হিস্ট্রি-কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন—
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল—
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খ'সে পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা।

আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া—
পʼড়ে কত হয় শেখা !

পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কী তারিখে।
কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ কʼরে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন—
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই—
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই,
কে পারে রাখিতে চেপে !
কেদারায় বসে সারাদিন ধʼরে
বই পʼড়ে পʼড়ে মুখস্থ কʼরে
কভু মাথা ধরে, কভু মাথা ঘোরে—
বুঝি বা যাইব খেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম !
আমরা যে ছোটো সেটা ভারি ভ্রম—
আকারপ্রকার রকম-সকম
এতেই যা কিছু ভেদ ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে
করি কতমতো গুরু-মারা টিকে—
লেখনীর ঘুচে খেদ ।

মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো ব'লে করেছি ধার্য—
আরামে পড়েছি শুয়ে ।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক—
আমরাও তাই, করিয়াছি ঠিক—
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি পইতে ছুঁয়ে ।

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর—
সাক্ষী বেদব্যাস ।

আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস।

আলোচাল আর কাঁচ-কলা ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য পেত হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ ক'রে—
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণতেজ
মনু তর্জমা প'ড়ে।

সংহিতা আর মুর্গি-জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই—
নিমাই, নেপাল, ভুতো।
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো।

ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে-সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই!
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবনচরিত
না জানি তা হলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস্‌!
মিল ক'রে ক'রে কবিতা লিখিত,
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছুদিন তবু কাগজ টিঁকিত—
উন্নত হত দেশ।

না জানিল তারা সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্মবরষ
মুখস্থ হল নাকো!

ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ—
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,
লজ্জায় মুখ ঢাকো।

আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিস্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা।
জ্বলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা ক'রে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে—
তবুও যা হোক স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা।

যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি' সমর—
আহা ক্রমোয়েল, তুমিই অমর।
থাক্ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর—
কাহিল হতেছে বোধ।
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।—
আরে আরে, এসো! এসো ননিবাবু!
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু,
কালকের দেব শোধ।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,
পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।

পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্ব'লে
কোথা সে পুণ্যজ্যোতি!
দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে—

তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল—
আমার এ পাপ করি দাও লীন
তোমার পুণ্য-মাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী,
লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ, আনন্দময়ী—
আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতিদূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে।

তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া—
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া?
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হতে?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন গুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম।
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।

সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় ছুটো চোখ—
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূর দিশি,
স্থনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিতত্তড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে

তিমিরতূলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশচিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত,
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি—
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।

চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী,
বীণা খসে যায় পড়ি—
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণনীরে!
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত—

লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক। পারি নে ভাসিতে
কেবল মুরতিস্রোতে।
লহো মোরে তুলে আলোকমগন
মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম-ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

থামো একটুকু, বুঝিতে পারি নে,
ভালো করে ভেবে দেখি—
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি!
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি

পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি!
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা-সম—
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে—
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযূর রেখা—
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব জগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি—

আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ-
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্‌-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

২২-২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

হউক ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই!
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)–
কেন তাহে তব রোষ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী—
জান কি, বন্ধু, উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হয়ে উঠেছে ফুটিয়া
হৃদয়শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো
পোহাইয়ে দুখরাত।

উঠিতেছে কত কণ্টকলতা,
ফুলে পল্লবে ঢাকে—
গভীর গোপন বেদনা-মাঝারে
শিকড় আঁকড়ি থাকে ;
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে গানে—
মরীচিকা রচি মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে।
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্মকুসুম মম—
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্নসম।
কোনো ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া,
কোনো ফুল বেঁচে রবে,
কোনো ছোটো ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।

তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন,
নয়নে কঠোর হাসি—
দূর হতে যেন ফুঁসিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি!
কঠিন বচন জরিছে অধরে
উপহাস-হলাহলে—

লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালোবেসে যাহা ফুটেছে পরানে
সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো,
অন্তরমাঝে সবাই সমান—
বাহিরে প্রভেদ হবে—
একের বেদনা করুণাপ্রবাহে
সান্ত্বনা দিবে সবে,
এই মনে ক'রে ভালোবেসে আমি
দিয়েছিনু উপহার।
ভালো নাহি লাগে ফেলে যাবে চলে,
কিসের ভাবনা তার!

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও-না এনে,
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু, জানিয়ো আলোক কখনো
থাকে না তো ছায়া বিনা—

ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে,
তুমি করিয়ো না ঘৃণা।
এতই কোমল মানবের মন,
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিকো যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে
মর্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহে তো সহজ,
দিতে হয় সারা প্রাণ—
মানবমনের অনল নিভাতে
আপনারে বলিদান।

ঘৃণা জ্ব'লে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন।
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন।
তুমিও রবে না, আমিও রব না,
দুদিনের দেখা ভবে—
প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি
তাহা চিরদিন রবে।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি—
অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে
দিব না কি তাহা সবে?
হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়,
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে।
যদি ভুল হয়, কদিনের ভুল!
দুদিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

কবির প্রতি নিবেদন

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি ?
চারি দিকে লোকজন চলিতেছে সারাখন,
আকাশে উঠিছে খর রবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানসভুবন ?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা— মুক্ত পবন ?

নিখিলের আনন্দধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম ?
জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর,
শুনিতেছ আপনারই নাম !

আকাশের পাখি তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে ?
বলে সবে বাহা-বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে !

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাতগগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।

পথ হতে শত কলরবে
'গাও গাও' বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই— গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে।

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতর হবে!
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মতো বসে রবে।

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।
শুনে যারা যায় চলে দু-চারিটা কথা ব'লে
তারা কি তোমায় ভালোবাসে?

কতমতো পরিয়া মুখোশ
মাগিছ সবার পরিতোষ!
মিছে হাসি আনো দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তারা ধরে কত দোষ!

মন্দ কহিছে কেহ ব'সে,
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ, দম্ভভরা দেহ,
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে,
'শাবাশ' 'শাবাশ' বলে কেহ।

হায় কবি, এত দেশ ঘুরে
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে!
এ যে কোলাহলমরু— নাই ছায়া, নাই তরু—
যশের কিরণে মরো পুড়ে।

দেখো হোথা নদী পর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চিররূপরাশি, চিরমধুময় হাসি,
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখো— একেলা আপনি
আকাশের তারা গনি গনি
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে,
সেথায় পশে না কলধ্বনি!

দেখো হোথা নূতন জগৎ,
ওই কারা আত্মহারাবৎ—
যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখো, না পূরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস—
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা,
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কারা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন—
হৃদয়ের স্রোত উঠি গোপন আলয় টুটি
দূর দূর করিছে মগন।

ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল-পুরে—
অরুণ-প্রকাশ প্রায় আকাশ ভাসিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

কোথা উঠে নবীন তপন,
কোথা হতে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালোবাসা, নব গান, নব আশা—
অসীম বিরামনিকেতন।

হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়—
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল -মাঝে ?

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

গুরু গোবিন্দ

বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়।

নিশি-অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা, বন সুগভীর;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়—

যাও রামদাস, যাও গো লেহারী,
সাহু, ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে;
এখনো পড়িয়া থাক্‌ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে
সুদূরে মানব-সাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন—
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্পসমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্‌।

হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়

রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্নবিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারি দিক -ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—

কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার—
সুখসম্পদ-মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু-মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে পূর্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার' কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরি-মাঝে।

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে—
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—

নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই ব'সে ব'সে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে—
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়'—
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'।

বলিতে বলিতে প্রভাততপন
উঠিল আকাশ-'পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মুরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি,
বিদায় মাগিল অনুচরগণ—
নমিল ভক্তিভরে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল্‌ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরি মালা কত দূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবরন ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে-হীরকে-গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

পরিত্যক্ত

বন্ধু,

মনে আছে, সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন
রক্তকমল ফুটে।

প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে
চাহি রহিতাম একা—
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণলেখা,
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎরাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার—

হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে,
পরশ লভিনু তার।
ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ—
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ-মাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
'এই লহ, মাতঃ, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।'

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরই কথা শুনে।
সেইদিন হতে কণ্টকপথে
চলিয়াছি দিন গুনে।
পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা,
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে যায়
ছিল যারা আপনার।

ধ্রুবতারা-পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে, বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ, 'বসে থাকো বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো।
যা হবার তাহা আপনি হইবে,
কাজ কি এতই আলো!'
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্যপাশ
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এত দূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি—

চিরজীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি।
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি ?

তবে সেই ভালো, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক—
গৃহকোণে এই জীবন-আবেগ
করি বসে পরিপাক।
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,
শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু।
ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলি-সাথে তারে
ক'রে দিই একাকার।

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?
সে নবীন আশা নাইকো যদিও
তবু যাব এই পথে—
পাব না শুনিতে আশিস্‌বচন
তোমাদের মুখ হতে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নতুন পরান আনি
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।
আকাশে চাহিব— হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল,
নয়ন আলোকহারা।

মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা-হা-হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কী করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হতে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ভৈরবী গান

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিকপরান
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি।
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার—
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সংকটময় কর্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।
তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ-
ভবনে।
সেই কুহুকুহরিত বিরহরোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে!

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে-আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপনমর্মদাহিনী।

এই আপনা-মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী!
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে—
'হল না কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হতে তুলি লবে না!

'এই সংশয়মাঝে কোন্ পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া!
আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া!

'যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!

কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

'শেষে দেখিব পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া।
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া।

'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এত দিন আছে
কী আশে!
সেই ডাগর নয়ন, সরস অধর,
গেল চলি কোথা দিয়া সে!'

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে !
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে।
পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে !

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া,
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।
তারা প'ড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিতলতার বাঁধন
টুটিতে।

তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে।

তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো-পানে আবিষ্টপ্রাণে
চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা
দিবসরজনী বাহিয়া।

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে।

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ধর্মপ্রচার

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়

কলিকাতার এক বাসায় :

ওই শোনো, ভাই বিশু,
পথে শুনি 'জয় যিশু' !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু।

কূর্ম কল্কি স্কন্দ
এখন করো তো বন্ধ।
যদি যিশু ভজে রবে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ।

ওই দেখো, ভাই, শুনি—
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি
বিষ্ণু হারীত নারদ অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি !

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম।
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদ-পুরাণের মর্ম।

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো।
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করি—
কোমর বাঁধিয়া লাগো।

কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে লও লাঠি।
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা,
খৃস্টানি হবে মাটি।

কোথা গেল, ভাই, ভজা
হিন্দুধর্মধ্বজা ?
ষণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হত দুশো মজা।

এসো মোনো, এসো ভুতো,
প'রে লও বুট জুতো।
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোনো ছুতো।

আগে দেব হুয়োতালি,
তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে, পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালি।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,
আমি নেব টুপি কেড়ে।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

কাঁচি দিয়ে তার চুল
কেটে দেব বিলকুল।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে দেব নির্মূল।

তবে উঠ, সবে উঠ—
বাঁধো কটি, আঁটো মুঠো।
দেখো ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি-জুটো।

দলপতির শিস ও গান :

প্রাণসই রে,
মনোজ্বালা কারে কই রে!

কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাঠি হস্তে, মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান। পথে বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম। গেরুয়াবস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃতপদ মুক্তিফৌজের প্রচারক :

ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম।

ভুবনমাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।

ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক।
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।

তৃষিত যাহারা জীবনের বারি
করো তাহাদের দান।
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে করো ত্রাণ।

'ওরে ভাই বিশু, এ কে!
জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে।'

'হারু, তবে তুই এগো!
বল্— বাছা তুমি কে গো।
কিচিমিচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!'

'বধির নিদয় কঠিনহৃদয়
তারে, প্রভু, দাও কোল।

অক্ষম আমি কী করিতে পারি—'
'হরিবোল ! হরিবোল !'

'আরে, রেখে দাও খৃস্ট !
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ !
দাঁড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাবা, পড়ো
হরে হরে হরে কৃষ্ট !'

'তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুস গুরুভার করিব বহন—
'বেশ' বাবা, বেশ বেশ !'

'দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে।
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন- আপনার দেশ-
হয়েছি সর্ব- ত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি

ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি!
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে—
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।
তখন তোমার রক্তসিক্ত
ওই মুখপানে চাহি—
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি।
ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা
ঘরে যাক সুধা নিয়ে।
পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে,
পড়ুক প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে।'

'আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্যরক্ত দহে!'
'ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাও তো হে!'

'যদি চাস তুই ইষ্ট
বল মুখে বল্ কৃষ্ট।'
'ধন্য হউক তোমার নাম,
দয়াময় যিশুখৃস্ট।'

'তবে-রে, লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি।'
'হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা,
খৃস্টানি হোক মাটি!'

প্রচারকের মাথায় লাঠিপ্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত।
রক্ত মুছিয়া :

প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন তিনি শুভমতি।
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি।

'ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাশা দেখার এই কি সময়—
প্রাণে ভয় নেই কারু?'

'পুলিস আসিছে গুঁতা উচাইয়া,
এইবেলা দাও দৌড়!'

'ধন্য হইল আর্য ধর্ম
ধন্য হইল গৌড়।'

উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন

বাসায় ফিরিয়া :

সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি।
মেজবউ কোথা, ডেকে দাও তারে।
কোথা ছোকা, কোথা লুচি?
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি,
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী ক'রে বসি!
স্বামী ঘরে এল যুদ্ধ সারিয়া,
ঘরে নেই লুচি ভাজা!
আর্যনারীর এ কেমন প্রথা—
সমুচিত দিব সাজা।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে খেলে সবে।
মারধোর করে হিন্দুধর্ম
রক্ষা করিতে হবে!
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচিছোকা!
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে খোকা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ

বাসরশয়নে

বর ॥ জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এসো, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা-মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক-ঠাঁই—
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মধু খাই।
জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরান হয়ে ছিল ছাই—
তোমার অপার প্রেমপারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার— 'আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই।'
ওঠ কেন ওকি, কোথা যাও সখী ?
কনে ॥ সরোদনে ॥ আইমার কাছে শুতে যাই।

দুদিন পরে

বর ॥ কেন, সখী, কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে ?

উষা কি তাহার শুকতারা-হারা,
তাই কি শিশির ঝরে ?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে ?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি
আশার সমাধি-’পরে ?
খসে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে ?
কী লাগি কাঁদিছ ?

কনে ॥ পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

অন্দরের বাগানে

বর ॥ কী করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো ক’রে ব’সে তরুমূল ?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলো চুল।
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে যায় নদী কুলুকুল্।
সারা দিনমান শুনি সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল্!
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে আছে বুঝি ঝুরো ফুল ?

বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল ?
কার কথা বলি বায়ু পড়ে ঢলি,
কানে দুলাইয়া যায় দুল ?
গুন্‌গুন্ ছলে কার নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল ?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল—
কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে ?

কনে ॥ খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।

বর ॥ আসিয়াছি কাছে, মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয়।
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয়।
আজি মোর মন কী জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়—
আজি প্রাণ খুলে মালতীমুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।
যেন আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি
আশা-ভরা দুটি কথা কয় !
ও হৃদয় টুটে যেন প্রেম উঠে
নিয়ে আধোলাজ আধোভয় !
তোমার লাগিয়া পরান জাগিয়া
দিবসরজনী সারা হয়—

কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়।
জগৎ ছানিয়া কী দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে, সখী, বলো করিব কী?
কনে॥ আরো কুল পাড়ো গোটা-ছয়।
বর ॥ তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর
শূন্য জীবন নিয়ে।
আমি চলে গেলে এক-ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জীয়ে।
বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে॥ দেব পুতুলের বিয়ে।

গাজিপুর
২৩ আষাঢ় ১৮৮৮

প্রকাশবেদনা

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে—
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

অরণ্য যথা চিরনিশিদিন
শুধু মর্মর স্বনিছে,

অনন্ত কালের বিজন বিরহ
সিন্ধু-মাঝারে ধ্বনিছে—

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্তিমান।

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত,
মর্মে রহিত ফুটিয়া।

আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা।
কিছু নেই পোড়া ধরণী-মাঝারে
বোঝাতে মর্মজ্বালা!

সোলাপুর
বৈশাখ ১৮৮১

মায়া

বৃথা এ বিড়ম্বনা।
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা!

ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন,
এই যদি পাই এই ভুলে যাই—
তৃপ্তি না মানে মন।
কত বার আসে, কত বার ভাসে,
মিশে যায় কত বার—
পেলেও যেমন না পেলে তেমন,
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে
নির্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে!

কত দেখাশোনা কত আনাগোনা
চারি দিকে অবিরত—
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে,
তারি তরে ব্যথা কত!

চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে,
যুগ-যুগ গেছে চ'লে—
মানবের মেলা করে গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে,
এই ছায়া-লাগি কত নিশি জাগি
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে,
মহাসুখ মানি প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কার হাসিকথা—
কোথা তারা আজ, সুখ দুখ লাজ
কোথা তাহাদের ব্যথা ?
কোথা সেদিনের অতুলরূপসী
হৃদয়প্রেয়সীচয় ?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া
আজ সে স্বপনও নয় !
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত—
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মতো।
এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস ?

যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন
মেঘখানি ভালোবাসে—
এও চলে যায়, সেও চলে যায়,
অদৃষ্ট ব'সে হাসে !

রোজ্‌. ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার ।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার ।
জগতে কেহ যেন নাহি আর !

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর-সব ।

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে ।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে ।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে ।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার !

আছে তো তার পরে বারো মাস—
উঠিবে কত কথা কত হাস।
আসিবে কত লোক কত-না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

রোড্‌স্‌ ব্যাঙ্ক্‌। থিরকি
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

মেঘের খেলা

স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালোবাসা হ'ত না হত-আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।

মেঘের খেলা-সম হ'ত সব
মধুর মায়াময় ছায়াময়।
কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কেবল মেলামেশা গগনে
সুনীল সাগরের পরপারে—
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি ঘিরি,
শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙিয়া—
কখনো ঘননীল বিজুলি-ঝিলিমিল,
কখনো উষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা
তেমনি বাধা তার সুকঠিন—

সকলি লঘু হয়ে কোথায় যেত বয়ে,
ছায়ার মতো হ'ত কায়াহীন।

চাঁদের আলো হ'ত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষণ—
সাক্ষী করি বিধু মিলন হত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিরতৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর—
প্রেমের থরে থরে, বিরাম জাগিত রে,
দুখের ছায়া-মাঝে রবিকর।

রোজ্‌ ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল,
আপন-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিকো তাহার সীমা।

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।

ধ্যান

তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন—
আমি অশান্ত, বিরামবিহীন,
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো
২৬ শ্রাবণ ১৮৮৯

পূর্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক—
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার?
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে।

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো তো বেসেছে তারা—
আমি তত দিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া?
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যূষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়—
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়!

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতিপুরাতন বিরহমিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিলপ্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে—
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

আশঙ্কা

কে জানে, এ কি ভালো!
আকাশ-ভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো—
কে জানে, এ কি ভালো!

কত-না শোভা, কত-না সুখ,
কত-না ছিল অমিয়মুখ,
নিত্যনব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে—
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ,
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারি ধারে—
কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে, এ কি ভালো!

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।

দিবসনিশি জাগিয়া আছি,
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে—
চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যুরেখা কালো।
কে জানে, এ কি ভালো!

জোড়াসাঁকো
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯

ভালো করে বলে যাও

ওগো, ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও!
যদি না বলিবে কিছু তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও!

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায়-হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

সেথা নিভৃতনিলয়সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলনমুদিত বুকে।

আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল,
চাহিব না মুখে মুখে।
যবে ফুরাবে তোমার কথা
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলি যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা-পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দুনয়ানে।

তবে ভালো করে বলে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধো ভাষা পূরে
কেন এসে গান গাও!

শান্তিনিকেতন
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা

ফিরি প্রিয়গৃহ-পানে ? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা— দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে ?

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া ?—
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন, গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে ; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনা-সম ; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।

প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণী-সম।

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন!
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি আর-এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন গগনে নেহারি

ঘনঘটা, উর্ধ্বনেত্রে চাহি মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি ।'
কোথায় অবন্তিপুরী, নির্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া, যেথা নিশিদ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
কচিৎ বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল ।

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে

কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায় !
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়। হেরি, চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান!
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ!
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ!
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে!

শান্তিনিকেতন
৭।৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০
অপরাহ্নে বর্ষা

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ—
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা-মাঝে? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন, কলহ,
আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপনিদ্রা ভেদ ক'রে
কর্ণে তোর— জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর?
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ

ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব— সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে ?

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি।
আপনার বক্ষ-'পরে, দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব— জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক !
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শসুখ—
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা— তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে

লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে প'ড়ে যায়—
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র। হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে,
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরল ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা

পদে পদে চিনে চিনে! দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয়; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১১।১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

গোধূলি

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
সন্ধ্যার বাতাস বয়ে যায়।
আয় নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।
কিছু আর নাহি যায় দেখা—
কেহ নাই, আমি শুধু একা;
মিশে যাক জীবনের রেখা
বিস্মৃতির পশ্চিমসীমায়।
নিষ্ফল দিবস-অবসান—
কোথা আশা, কোথা গীতগান!
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তটবালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো—
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়।
আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ—
আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়।
মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে
চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
আয় নিদ্রা, আয়।

সোলাপুর
১ ভাদ্র ১৮৯০

উচ্ছৃঙ্খল

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে ?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
আমি কেঁদেছি হেসেছি, ভালো যে বেসেছি—
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচনসম।
প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই—
আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বৈ।
আমি আমারে চিনি নে, তোমারে জানি নে—
আমার আলয় কই !

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে—

চিরকাল ধ'রে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী।
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল—
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল!
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত-যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত-যে আকুল আশা,
কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।

ওগো তোমরা জগৎবাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ-পরশ-রাশি—
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তারি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কাননশেষে।
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুল বাসনাসংগীত গাই
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা।
ওগো, মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা।

অধিক সময় নাই।
ঝড়ের জীবন ছুটে চলে যায়
শুধু কেঁদে 'চাই চাই'।

যার কাছে আসি তার কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই।

ওগো, তবে থাক্, যে যায় সে যাক—
তোমরা দিয়ো না ধরা!
আমি চলে যাব ত্বরা!
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো।
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া
তার পরে পথ ছাড়ো!

তার পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতিদিবসের মতো!
কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া,
মিশায়ে যাইবে কোথা!
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

আগন্তুক

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব-ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময় ভরে
চেয়েছিল চারি দিকে
বেদনা-বাসনা-ব্যাকুলতা-ভরা
তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার,
কণ্ঠে ছিল না মালা,
কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।

তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তারে দেখে—
শুধালে না কেহ পরিচয় তার,
বসালে না কেহ ডেকে।
কী বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে—
দীপালোক হতে বাহিরিয়া গেল
বাহির-অন্ধকারে।

তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কী হইল তার শেষে ?
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে ?

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

বিদায়

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ -মাঝে ! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হতে দূরে ভেসে যাব— অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্তদেশে
এক মুহূর্তের তরে, সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি ! ওগো বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিমপানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ-আঁখি।
মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন

দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন,
বহুদিন পরে, তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে— দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপনসমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার।
এই তটপ্রান্তে বসে শ্রান্ত দু নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধ'রে
তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চিরচঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি— রহস্য অপার—
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

কোল্‌ভিল্‌ টেরেস্‌। লণ্ডন
আশ্বিন ১৮৯০। রাত্রি

সন্ধ্যায়

ওগো, তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত,
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওইমতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে
দিবসনিশার প্রান্তদেশে।
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক কলরব
সংসারের জনহীন শেষে।
এসো তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এসো তুমি নয়ন-আনত।
এসো তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মতো।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্ত-আঁখি,
পড়ে থাকি পৃথিবীর 'পরে—
খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।

বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়নপল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায়ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব।

রেড সী
৭ কার্তিক ১৮৯০

শেষ উপহার

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল, ফুরালো আমার কাল;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি; গুন্ গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর;
গাহে পাখি, বহে বায়ু; প্রমোদহিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে-মনে কথা।

আর কি দিই নি কিছু! প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝ'রে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে
একটি শিশিরকণা। চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার,

প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল ক'রে
তোমার তরুণ মুখ, রজনীর অশ্রু-'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম—
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

রেড্‌ সী
৯ কার্তিক ১৮৯০

মৌন ভাষা

থাক্ থাক্ কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা !
চেয়ে দেখি, চলে যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখির প্রায় অজানা কাননছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা ;
তারে বাঁধিয়ো না ধরে, বলিয়ো না কোনো কথা।

আঁখি দিয়ে যাহা বলো সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভালো, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই—
কথা দিয়ে বলো যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে !
এত মৃদু এত আধো অশ্রুজলে বাধো-বাধো,
শরমে-সভয়ে-ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বোলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।

তুমি হয়তো বা পারো আপনারে বুঝাইতে,
মনের সকল ভাষা প্রাণের সকল আশা
পারো তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে—
আমি তো জানি নে মোরে, দেখি নাই ভালো ক'রে
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে—
কী বুঝিতে কী বুঝেছি, কী বলিব কী বলিতে।

তাবে থাক্। ওই শোনো, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর—
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়।
আরো ঊর্ধ্বে দেখো চেয়ে অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায় ;
প্রাণপণ দীপ্ত ভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়।

এসো চুপ করে শুনি এই বাণী স্তব্ধতার,
এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলে স্থলে—
মনে করি হল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়তো তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মতো আমি বুঝে যাব আর—
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার।

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি—
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনি নাকো কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চ'লে,
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে—
বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে।

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই-যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জলে ভালো,

কে বলিতে পারে বলো যাহা চাও এ কি তাই!
তবে ইহা থাক্ দূরে   কল্পনার স্বপ্নপুরে—
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই,
এই চির-আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।

এসো তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে   ঘিরে দিক দুজনারে—
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে   আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।
তবে আর কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।

রেড্ সী
১০ কার্তিক ১৮৯০

আমার সুখ

ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাকো
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা
তুমি পেলে নাকো।
এই-যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা
সারা দিনমান,
এরই মাঝে চারি পাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ, ওই হাসি,
ওই দু'নয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাকো।
তাই ভাবি এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাকো।

কোনোদিন একদিন আপনার-মনে শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা
আমারে এমনি ক'রে ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা!
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি,
বিষাদকোমল হাসি
ভাসিত অধরে—

নয়নে জলের রেখা এক বিন্দু দিত দেখা,
তারি 'পরে সন্ধ্যালোক
কাঁপিত কাতরে—
ভেসে যেত মনখানি কনকতরণীসম
গৃহহীন স্রোতে—
শুধু একদিন-তরে আমি ধন্য হইতাম,
তুমি ধন্য হতে।

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি -সম ?
নাই সীমা আগে পাছে— যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে
তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস
দিতে পারো ভ'রে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরানে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা

আমার সুখ

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাও নি যদি দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি ব'কে।
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই
ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি—
আর আশা নাহি রাখি
সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই—
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই!

য়েড্‌. সী
১১ কার্তিক ১৮৯০

পরিশিষ্ট

১ রবীন্দ্রনাথের লেখা দুইখানি চিঠি।
২ রবীন্দ্রনাথের লেখা একখানি চিঠি।
তিনখানি পত্রই প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ;
এই গ্রন্থে অংশতঃ সংকলিত।

নিষ্ফল উপহার : পাঠান্তর[1]

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল।
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জি উঠে[2] অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

১ ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯১৫ খৃস্টাব্দ) মুদ্রিত 'মানসী'তে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতার এই রূপান্তরিত পাঠটি দেখা যায়। 'কথা ও কাহিনী'র 'কাহিনী' অংশে এই পাঠটিই কয়েকটি পরিবর্তন-সহ মুদ্রিত হইয়া থাকে।

২ উঠে গর্জি ; ওঠে গর্জি : কথা ও কাহিনী

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে ;
দাঁড়ায়ে রয়েছে[১] গিরি আপনার ছায়ে
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়াশব্দহীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা[২]
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি[৩] করতল।
কনকে-মাণিক্যে-গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরী।

১ হেরিছে : পাণ্ডুলিপি
২ উত্তরিল : কথা ও কাহিনী
৩ সঁপিয়া : পাণ্ডুলিপি

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি 'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণ মন কায়
একখানি বাহু[১] হয়ে ধরিবারে যায়[২]।

বারেকের তরে গুরু না তুলিয়া মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে[৩] তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্তবস্ত্রে রিক্তহাতে শ্রান্তনতশিরে
রঘুনাথ গুরুকাছে আসিলেন ফিরে!

১ হাত : পাণ্ডুলিপি
২ ধায় : পাণ্ডুলিপি এবং কথা ও কাহিনী
৩ অন্তরে : কথা ও কাহিনী

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

মানসী

২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮

মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ যে, তার মধ্যে একটা despair এবং resignation -এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই despair এবং resignation -এর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু[1] যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল : হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু, এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক-একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর-একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে— সেইজন্যে এক দিকে বেদনা, আর-এক দিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা, আর-এক দিকে ফিলজফি। এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর-এক দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। এক দিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর-এক দিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।

১. আশুতোষ চৌধুরী

২

ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা— বড়ো রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কী চায় তা কিছু জানে না— এক-ঘটী জল চায় কি আধখানা বেল চায় জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না ; আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপসে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করছি। জানি সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষ-জনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানবমনের মুখের উপর সর্বদা জবাব করে— তাই ধ্যানভরে কল্পনাসিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্ছে— কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশি আজ্ঞাবহ! তাই জন্যেই সাধ যায়, 'সত্য যদি হত কল্পনা'— আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম! অর্থাৎ, আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মতো অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মতো অসীম ক্ষমতা নেই— কেউ-বা বলছে আছে, ব'লে বহির্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে— কেউ-বা জানে নেই, তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্ধ-নিরাশ্বাস ভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পুজো করছে। একেই বলো ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

মেঘদূত

২৪ মে ১৮৯০

[শান্তিনিকেতন]

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখতে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার-ছায়াটাকে আপনার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড ভাবে বিস্তৃত দেখতে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে হুহুঃ শব্দ করতে করতে ধুলো শুকনো-পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে— তার পরে, বড়ো বড়ো গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ফলে-পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে— কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দিকের ঝড় এরই উপরে এসে প'ড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে; সেদিন তো একটা দরজা টুকরো টুকরো করে ভেঙে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত— যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান— ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মতো সহবত শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্যরীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারে না, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থঘরেব জিনিসপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু, এরকম অশিষ্টাচরণ সত্ত্বেও লেগেছিল ভালো।

বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্ণে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে— কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে— অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা— এইজন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারই উপরে আরোপণ ক'রে বিচিত্র নদী পর্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে করতে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী-হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়, সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহু-দূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে, সেইখানে চরম বিশ্রাম— সেই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাকলে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু, সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই— রয়ে বসে— আপনার স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণ উপভোগ ক'রে— পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্যের কোনোটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না ক'রে— রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্ছে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়তো ঠিক 'ড্রামাটিক' হয় না— একটা দক্ষিণে ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধ হয় তার পক্ষে ঠিক হত, কিন্তু তা হলে পাঠকদের অবস্থা কী হত বলো দেখি। আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি— মনটা উদাস হয়ে আছে— আমাদের একবার মেঘের মতো মহা স্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর

অতুল ঐশ্বর্যের বর্ণনা কি তেমন ভালো লাগাত? আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কাজকর্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চলছে না। তবুও আমি বদ্ধ হয়ে আছি, ছুটি পাচ্ছি নে। আজ এই কর্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়— আজ তো আর কোনো দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই, সংসারের সহস্র ছোটোখাটো কর্তব্য আজকের এই মহাদুর্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে, আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত! যে-সকল নদী গিরি নগরীর সুন্দর বহু প্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আসতুম। বাস্তবিক, কী সুন্দর নাম! নাম শুনলেই টের পাওয়া যায় কত ভালোবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল, এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য আছে। রেবা শিপ্রা বেত্রবতী গম্ভীরা নির্বিন্ধ্যা, চিত্রকূট আম্রকূট বিন্ধ্য, দশার্ণ বিদিশা অবন্তী উজ্জয়িনী, এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে; এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়ছে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্ছে। এদের জম্বুকুঞ্জের ফল পেকে আকাশের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে; দশার্ণ গ্রামের চতুর্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে, সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুলতে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে; রাজপথের অন্ধকার এমনি প্রগাঢ় যে, সূচী দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল, তা হলে এ-সব দেশ না দেখে কি যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল, তা হলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত; যক্ষ যদি উনবিংশ শতাব্দীর হয় তা হলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ

করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মতো তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিক-সম্প্রদায় থাকত, তা হলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত, তা হলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক ড্রামাটিক ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ প্যাস্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিক্‌দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি, যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনই হোক, আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে। ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলছি dramatic হয় নি। কিন্তু, আমার বেশ লাগছে। আমার আর-একটা কথা মনে পড়ছে— যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে-লিখিত দেশ-দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত, তাদেরও তো বিরহব্যথা ছিল। এইজন্য অলকা যদিও মেঘের terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী স্টেশনে এই-সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে-সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ-বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয় নি; কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন, তা হলে ভারি ভুল করা হয়। আমি তো বলতে পারি, আমি এতে খুশি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়, এমন-কি, প্রণয়িনী কাছে থাকলেও হয়; কবি নিজেই লিখেছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

অর্থাৎ, মেঘলা দিনে প্রণয়িনী গলায় লেগে থাকলেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়, দূরে থাকলে তো কথাই নেই। অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্‌ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে, কেবল

ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্ত দিতে হবে। আজকের সমস্ত সংসার দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে।

মেঘদূত পড়তে পড়তে আর-একটা চিন্তা মনে উদয় হয়।— সেকালেই বাস্তবিক বিরহী-বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিক-বধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব করতে পারি নে। পোস্ট্‌-অফিস এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন তো আর প্রবাস বলে কিছু নেই— তাই জন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে আর্দ্রতন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকে না। ডেস্কের সামনে বসে চিঠি লিখে মুড়ে টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে নিশ্চিন্তমনে স্নানাহার করে। এমন-কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্বে যখন ভালোরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিসের বন্দোবস্ত হয় নি, তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল ; তাই—

প্রবাসে যখন যায় গো সে

তারে বলি বলি আর বলা হল না !

কবিদের এ-সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে কোরো না, আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে চিঠির মধ্যেই পোস্ট্‌-অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করছি। আমি পোস্ট্‌-অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করছি যে, যখন মেঘদূত বা কোনো প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোনো প্রবাসে বিরহশয়ানে বিলীন হয়ে থাকে এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোনো

দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জানতে পারি— তা হলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্, বিদেশেই থাক্, এবং ভালোবাসা যেমনই থাক্— সকলেই বেশ comfortably কালযাপন করছে, এটা কী রকম গল্পোপযোগী শোনায়!

—

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

'মানসী'র যে কবিতাগুলি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

পৃষ্ঠা	কবিতা	প্রথম প্রকাশ	পত্রিকায় নামান্তর
১৯	ভুলে	আষাঢ় ১২৯৪ পৃ ১৬৪	এসেছি ভুলে
২৫	বিরহানন্দ	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ পৃ ৮৩	বিফল মিলন[১]
২৮	ক্ষণিক মিলন	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ পৃ ৮৩	বিফল মিলন[২]
৩০	শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা	শ্রাবণ ১২৯৪ পৃ ২০৩	নূতন প্রেম[৩]
৬৯	পত্র	বৈশাখ ১২৯৪ পৃ ৫৬	
৭৩	সিন্ধুতরঙ্গ	শ্রাবণ ১২৯৪ পৃ ২৩০	মগ্ন তরী[৪]
৭৯	শ্রাবণের পত্র	আশ্বিন ১২৯৪ পৃ ৩৫২	শ্রাবণে পত্র[৫]
৯৭	জীবনমধ্যাহ্ন	বৈশাখ ১২৯৬ পৃ ৫৩	

১ 'বিরহানন্দ' কবিতায় 'বিফল মিলন' রচনাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক বর্জন করিয়া অবশিষ্ট অংশ কিছু কিছু পরিবর্তনসহ গৃহীত হইয়াছে।

২ 'বিফল মিলন'এর দ্বিতীয় স্তবকটির সহিত 'ক্ষণিক মিলন' কবিতার তৃতীয় স্তবকের যথেষ্ট মিল আছে।

৩ 'মানসী'তে সংকলন-কালে 'নূতন প্রেম'এর তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম স্তবক বর্জন ও অল্পস্বল্প পাঠপরিবর্তন করা হইয়াছে।

৪ 'মানসী'র পাঠ পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ হইতে বহুশঃ ভিন্ন।

৫ 'শ্রাবণের পত্র' কবিতার সূচনায় অষ্টম ছত্রের পর সাময়িক

পরিশিষ্ট

পত্রিকায় ছিল—

রাজছত্র ফেলো শ্যাম এসো এই ব্রজধাম
কলিকাতা যার নাম কিম্বা ক্যাল্‌কাটা।
ঘুরেছিলে এইখেনে কত রোডে কত লেনে,
এইখেনে ফেলো এনে জুতোসুদ্ধ পা'টা।

ঐরূপ এই গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় নিম্ন হইতে গণনা করিলে চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অন্তরে পত্রিকায় যা ছিল—

আষাঢ় কাহার আশে বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে দিবসরজনী!
আছে ভাব, নাই ভাষা— আছে শস্য, নাই চাষা—
আছে নস্য, নাই নাসা— এও যে তেমনি।

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অষ্টম পত্রে এই কবিতাটি আছে; 'মানসী' হইতে বর্জিত ছত্রগুলি সেখানে বাদ পড়ে নাই।

—

মূল্য ৩২·০০ টাকা